# ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

## বাংলাদেশের মানবাধিকারকর্মীদের জন্য একটি খড়্গ

FRONT LINE DEFENDERS

# সারসংক্ষেপ

*মানবাধিকারকর্মীদের মতে, বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বর্তমানে নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ চলছে। গত প্রায় এক দশকে ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের দ্বারা বেশ কয়েকজন লেখক-মানবাধিকারকর্মীর হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। এর পাশাপাশি প্রথমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে বাধা ও কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে বাংলাদেশের মানবাধিকারকর্মীদের জন্য এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; তারা ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। 'ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স' কর্তৃক ২০২১ সালের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে পরিচালিত এক গবেষণায় এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে।*

*ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর হবার পর গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় এটি স্পষ্ট যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারদলীয় সমর্থকদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচনাকারীদের দমাতে এই আইন এক মোক্ষম অস্ত্র। এই গবেষণাতেও এর সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ উঠে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আটজন মানবাধিকারকর্মীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিশ্লেষণ করেছে ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স। অভিযুক্ত মানবাধিকারকর্মী, তাঁদের সহকর্মী ও আত্মীয়-স্বজন, তাঁদের আইনজীবী এবং সম্ভাব্য অন্যান্য অংশীজনের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা পরিচালনকারী একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র যেমনঃ প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, চার্জশিট ও আদালতের অন্যান্য নথিপত্র বিশ্লেষণ করেছেন।*

*যে আট মানবাধিকারকর্মীর মামলা ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স বিশ্লেষণ করেছে তার মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনটি মামলায় অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে নেয় এবং ওই তিন মানবাধিকারকর্মীই রিমান্ডে নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ করেছেন। ছয়জন মানবাধিকারকর্মীর জামিন আবেদন বারংবার খারিজ হয়েছে, দুইটি মামলায় পুলিশ আগে গ্রেফতার করেছে, আর মামলা করা হয়েছে গ্রেফতারের পর। আটজন মানবাধিকারকর্মীকেই তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ করার বিনিময়ে মামলা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা হেনস্থার শিকার হন, কেউ কেউ সামাজিক বয়কটের মুখেও পড়েন। আটজন মানবাধিকারকর্মীই অভিযোগ করেছেন, তাঁরা এখনও ভীতির মধ্যে বসবাস করেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছেন এবং তাঁদের কার্যক্রম সীমিত করতে বাধ্য হয়েছেন।*

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ

# ভূমিকাঃ

২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর সংশোধনী আনা হয়। এরপর বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা এক নতুন মাত্রা পায় এবং এই বিষয় নিয়ে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় শাস্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদন্ড থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর এবং সর্বনিম্ন সাত বছর করা হয়। এই আইনের ৫৭ ধারা অনুযায়ী, ওয়েবসাইট বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মিথ্যা, অশ্লীল, অসৎ হতে উদ্বুদ্ধকারী, মানহানিকর, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা সৃষ্টিকারী, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রকাশকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারাদন্ডের পাশাপাশি এই অপরাধে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই সংশোধনী পরবর্তী বছরগুলোতে কয়েক ডজন সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীর বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় মামলা হয়, যার বেশিরভাগই দায়ের করে পুলিশ অথবা সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরা। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার পর সরকার একটা কৌশলী পদক্ষেপ নেয়। ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৪-৫৭ ও ৬৬ ধারা বাতিল ঘোষণা করে। কিন্তু ৫৭ ধারাকে আরো বিস্তৃত করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ নামে আরেকটি নতুন আইন পাশ করে। পাশাপাশি ইতোমধ্যে ৫৭ ধারায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোর বিচারপ্রক্রিয়া চলমান থাকবে বলে জানানো হয়।

২০১৩ সালের সংশোধনীর পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকার সাইবার অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৪,৬৫৭টি মামলা বিচারের জন্য এসেছে, যার ৮০ শতাংশ হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর হবার পর। এটা প্রমাণ করে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই আইন এমনকি পূর্ববর্তী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় চেয়েও ভয়ঙ্কর। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অনেক বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বিশেষ করে মানবাধিকারকর্মীদের ন্যায়সঙ্গতভাবে যে ধরনের ইস্যুতে সোচ্চার থাকতে হয়। এই আইনে ন্যায্য সমালোচনার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে পুলিশকে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই আইনে। এই আইনের ক্ষমতাবলে সরকার যে কোন ওয়েবসাইট বন্ধ করতে পারে এবং যেকোন কন্টেন্ট বা তথ্য সরিয়ে ফেলতে পারে। অর্থাৎ, সরকারের কোন নীতির সমালোচনা বা কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা থেকে সরকার সহজেই মানবাধিকারকর্মীদের বিরত রাখতে পারে, এমনকি কেউ বাধা উপেক্ষা করে এই ধরনের কাজ করলে তাকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিতও করতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে আদালতের নির্দেশনা ব্যতিতই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ডিজিটাল নজরদারীর সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মানবাধিকার কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এই আইন। এই আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকেই সাংবাদিক, অধিকারকর্মী এবং উন্নয়ন সহযোগীরা এর বেশ কিছু ধারাকে নিবর্তনমূলক হিসেবে চিহ্নিত করে। এই আইনে বর্নিত অপরাধসমূহ নয় সেকারণে। এই আইনের অপব্যবহারের ঝুকি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই আইনে অপরাধ চিহ্নিতকারী ২০টি ধারার ১৪টিই অজামিনযোগ্য, সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন। অধিকাংশ ধারা অজামিনযোগ্য হওয়ায় অভিযুক্তদেও জামিন না দিয়ে দীর্ঘদিন আটক রাখার সুযোগ রয়েছে এই আইনে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যেন সরকারের সামলোচকদের মাথার উপর ঝুলন্ত খড়্গ। এই আইনে মামলা দায়েরকারী বেশিরভাগ বাদি সরাসরি সংযুক্ত নন, বরং তারা রাজনৈতিক বক্তিবর্গের পক্ষে বিরুদ্ধমতকে দমনের জন্য এই আইন ব্যবহার করেন। কঠোর শাস্তির বিধান তো রয়েছেই, তাছাড়াও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা অন্য নানা কারণে একজনের জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা নিম্ন আদালতে জামিন পান না, উচ্চ আদালতে মামলা চালানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এই আইনের মামলাগুলো চলে দীর্ঘদিন, সবমিলিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা আর্থিক ও মানসিকভাবে অভিযুক্তকে পর্যুদস্ত করে তোলে।

# টার্গেট: মোঃ শরিয়ত বয়াতি

*গান-বাজনা ছেড়ে দিতে আগে থেকেই স্থানীয়ভাবে বাদি মাওলানা ফরিদুল ইসলাম এবং তার সংগঠন কওমি ওলামা পরিষদের উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর হুমকির মুখে ছিলেন শরিয়ত মিয়া ওরফে শরিয়ত বয়াতি। ২০১৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার ধামরাইয়ে একটি গানের আসরে তিনি ঘোষণা দেন, গানবাজনা হারাম এটা কেউ প্রমাণ করতে পারলে তিনি গান গাওয়া ছেড়ে দেবেন। তার এই বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে কওমী ওলামা পরিষদের ইন্ধনে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা ফরিদুল ইসলাম ২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন। পরদিনই শরিয়ত বয়াতিকে ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি গানের আসর থেকে গ্রেফতার করে চোখ বেঁধে মির্জাপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি তাঁকে আদালত তোলা হলে আদালত ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। নানামুখি চাপে শরিয়ত বয়াতির জামিনপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্থ হয় এবং দীর্ঘ সাড়ে ছয় মাসের বেশি সময় কারাভোগের পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২৬ তারিখ তিনি জামিন পান। ১১ মার্চ ২০২০ সালে পুলিশ শরিয়ত বয়াতির বিরুদ্ধে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগপত্র দেয় এবং তার মামলা এখনো চলমান রয়েছে। শরিয়ত বয়াতিকে এখনও নানা ধরণের চাপ ও নজরদারির মধ্যে থাকতে হচ্ছে এবং তিনি স্বাধীনভাবে গানবাজনা করতে পারছেন না।*

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার আগধল্যা গ্রামের বাসিন্দা মোঃ শরিয়ত মিয়া ওরফে শরিয়ত বয়াতি একজন বাউল। হোটেল শ্রমিক হিসেবে কাজ করেও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে এবং গানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে তিনি একজন লোকশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা এবং প্রান্তিক মানুষের মধ্যে লোকগান খুবই জনপ্রিয়। এই ধরণের গানে খুব সহজ ভাষায় এবং কথোপকথনের মাধ্যমে প্রেম, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, মানবতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাসহ বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়। নিজের বাড়িতে আয়োজনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়েও শরিয়ত বয়াতি বাউল গান গাইতেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বাউল সঙ্গীতকে মানবসভ্যতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

শরিয়ত বয়াতির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেন মাওলানা মোঃ ফরিদুল ইসলাম। তিনিও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার আগধল্যা গ্রামের বাসিন্দা এবং আগধল্যা হাফিজিয়া মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। মাওলানা মোঃ ফরিদুল ইসলাম কওমী মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন 'কওমী ওলামা পরিষদ'-এর সঙ্গেও যুক্ত।

শরিয়ত বয়াতি ২০১৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার একটি গানের আসরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যান। সেখানে পালাগানে তিনি বলেন, "গান-বাজনা হারাম এ কথা কোরআনের কোথাও বলা নাই। কেউ যদি গান-বাজনা হারাম প্রমাণ দিতে পারেন, তবে গান বাজনা ছেড়ে দেব।"

মামলার এজাহারে বাদী মাওলানা মোঃ ফরিদুল ইসলাম দাবি করেন, তিনি ইউটিউবে আপলোড করা শরিয়ত বয়াতির এই বক্তব্যের ভিডিও ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেখেন। ৫ জানুয়ারি ২০২০ শরিয়ত বয়াতি তার বাড়ির সামনে একই বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করলে তিনি ৯ জানুয়ারি ২০২০ মির্জাপুর থানায় মামলাটি দায়ের

করেন। তিনি এই মামলায় শরিয়ত বয়াতির বিরুদ্ধে 'ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত' দেওয়ার অভিযোগ আনেন।

একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় এই মামলার বাদী ও বিবাদী পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত। শরিয়ত বয়াতি বলেন, প্রতিবছর তাদের বাড়িতে বাউল গানের আসর হতো। মাওলানা ফরিদুল ইসলাম এলাকার কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই গান বন্ধ করার জন্য গত কয়েক বছর ধরে হুমকি দিচ্ছিলেন। এমনকি মাওলানা ফরিদুল ইসলাম শরিয়ত বয়াতির গানের আসর বন্ধ করার জন্য কিছু গ্রামবাসীকে নিয়ে এর আগেও পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন এবং পুলিশের সাহায্যে গানের আসর বন্ধের চেষ্টা করেছেন। ঘটনাক্রম এবং শরিয়ত বয়াতির বক্তব্য থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, শরিয়ত বয়াতিকে গান-বাজনা থেকে বিরত রাখাই এই মামলা দায়েরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। শরিয়ত বয়াতি নিজেও দাবি করেছেন, স্থায়ীভাবে গান বাজনা বন্ধ করে দেওয়ার বিনিময়ে বাদী তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

মামলার বাদী মাওলানা ফরিদুল ইসলাম এজাহারে উল্লেখ করেছেন, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তিনি ভিডিওটি দেখার পর টাঙ্গাইলের কওমী ওলামা পরিষদের সঙ্গে আলোচনার করে ২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি মির্জাপুর থানায় মামলাটি দায়ের করেন। এ বক্তব্য এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, মাওলানা ফরিদুল ইসলাম মামলার বাদী হলেও কওমী ওলামা পরিষদ এতে ইন্ধন ও সমর্থন যুগিয়েছে। ওই স্বার্থান্বেষী মহল পোস্টার, লিফলেট ছাপিয়ে, অনলাইনে প্রচারণা চালিয়ে শরিয়ত বয়াতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা করে এবং মিছিল-সমাবেশ করে তাকে গ্রেফতার, এমনকি ফাঁসির দাবিও তোলে।

- মামলা করার আগে শরিয়ত বয়াতিকে গান-বাজনা বন্ধ করতে হুমকি দেয়া হয়।
- অনলাইনে থাকা তার একটি বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়।
- মামলার বাদী তার প্রতিবেশী এবং একজন মাদ্রাসা শিক্ষক, যিনি কওমী ওলামা পরিষদের সাথে যুক্ত।
- জামিন পেতে বিলম্ব হওয়ায় শরিয়ত বয়াতি বিচার শুরুর আগে ছয় মাসের বেশী কারাভোগ করেন।
- তাঁকে গ্রেফতার ও তাকে ফাঁসির দাবীতে মিছিল-সমাবেশ হয়, পোস্টার ও লিফলেটও বিতরণ করা হয়।
- শরিয়ত বয়াতির পরিবারকে অনেকদিন একঘরে থাকতে হয়, সন্তানদের স্কুলে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।
- স্থীয়ভাবে গান-বাজনা বন্ধ করার বিনিময়ে বাদীর পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়।
- নানাধরণের চাপ ও নজরদারীর মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন।
- প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁর গানের অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয়া হয় না।

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানায় ২০২০ সালের ৯ জানুয়ারি মামলা হওয়ার পর বেশ দ্রুততার সাথে পরেরদিন ১০ জানুয়ারি রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার একটি গানের আসর থেকে শরিয়ত বয়াতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শরিয়ত বয়াতি ও তার আইনজীবী দাবি করেছেন, গ্রেফতারের পর তাকে চোখ বেঁধে গাড়িতে উঠানো হয় এবং গভীর রাতে তাকে মির্জাপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। কোন অভিযুক্তকে চোখ বেঁধে গ্রেফতার করা যেমন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনসঙ্গত নয়, তেমনি তা একজন ব্যক্তির মানবাধিকারেরও লঙ্ঘণ।

২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি শরিয়ত বয়াতিকে টাঙ্গাইলের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ড শেষে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। আইনি দীর্ঘসূত্রিতা এবং নানামুখী চাপ-প্রভাবে দীর্ঘ সাড়ে ছয়মাসের বেশি সময় কারাগারে থাকার পর শরিয়ত বয়াতি ২০২০ সালের ২৬ জুলাই

উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান। নানামুখি চাপের নজির হচ্ছে, মামলা হওয়ার পর পরই একটি মানবাধিকার সংগঠনের আইনজীবীরা শরিয়ত বয়াতির গ্রামে গেলেও তারা বয়াতির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে পারেননি। এছাড়া নিম্ন আদালতে শুনানির সময় তার আইনজীবীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়; এমনকী উচ্চ আদালতে জামিন শুনানির দিন কওমী ওলামা পরিষদের নেতারা আদালত ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে জমায়েত হয়ে শরিয়ত বয়াতিকে জামিন না দিতে চাপ প্রয়োগ করে। একই দিন জাতীয় সংসদে আলোচনায় রাষ্ট্রের শীর্ষ নির্বাহী তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। শরিয়ত বয়াতির আইনজীবী মনে করেন, এসব চাপেই আইনসঙ্গত কোন কারণ না থাকলেও ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট বেঞ্চ শরিয়ত বয়াতিকে জামিন দেয়নি। বরং তাকে কেন জামিন দেয়া হবে না, এই মর্মে একটি রুল জারি করা হয়। এভাবে তাঁর জামিন পেতে বিলম্ব হয়।

শরিয়ত বয়াতি মনে-প্রাণে একজন লোকশিল্পী, একই সঙ্গে গানবাজনা তার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। একটি স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মের দোহায় দিয়ে তার গান-বাজনা বন্ধের চেষ্টা করছিল। এই মামলার ফলে তাদের উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। শরিয়ত বয়াতি দাবি করেছেন, তিনি জামিনে মুক্ত হওয়ার পরে আগের মতো গান বাজনা করতে পারছেন না। এই মামলার ফলে তিনি একদিকে যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন, তেমনি সামাজিকভাবেও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে– এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তার গান বাজনা সীমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শরিয়ত বয়াতি দাবি করেছেন, তিনি আগে যেরকম মুক্ত ও স্বাধীনভাবে গান গাইতে পারতেন, ঘুরে বেড়াতে পারতেন, এখন আর তেমনটা পারছেন না; তাকে অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে বুঝে-শুনে চলাফেরা ও কথা বার্তা বলতে হয়। এটা স্পষ্ট যে, মামলা এবং মামলা পরবর্তী নানা ঘটনার ফলে শরিয়ত বয়াতির শিল্পীসত্ত্বা যেভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি তিনি শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের এই মামলার ফলে শুধু শরিয়ত বয়াতিকে নয়, তার পুরো পরিবারকে নানাভাবে হেনস্তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তার আইনজীবী বলেছেন, গ্রামের কিছু প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী লোক শরিয়ত বয়াতির পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট করার চেষ্টা চালায়। এর ফলে শরিয়ত বয়াতির পরিবার অনেকটা একঘরে হয়ে পড়ে, এমনকি তার সন্তানদের স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়।

মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী অনুযায়ী, শরিয়ত বয়াতির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৮(২) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। ২০২০ সালের পুলিশ টাঙ্গাইলের টাঙ্গাইলের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং আদালত সেই অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৮(২)ধারার পাশাপাশি ২৮(৩) ধারাও যুক্ত করা হয়। এই দুই ধারায় শাস্তির কথা বলা হলেও অপরাধের কথা বলা হয়েছে ২৮(১) ধারায়। এই ধারায় বলা হয়েছে, ‘যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উস্কানি প্রদানের অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু  প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপকার্য হইবে একটি অপরাধ।’

এখানে লক্ষণীয় যে, শরিয়ত বয়াতি তার বক্তব্য সম্বলিত ভিডিওটি নিজে ইউটিউবে আপলোড করেননি। এমনকি তিনি কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে ভিডিওটি আপলোড করিয়েছেন, মামলার এজাহার, প্রাথমিক তথ্য বিবরণী কিংবা অভিযোগপত্রে সেই দাবিও করা হয়নি। সেক্ষেত্রে ‘ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে কোন কিছু প্রকাশ বা

প্রচারের' মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যে শর্তাবলী রয়েছে, তা কোনভাবেই পূরণ হয় না। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, শরিয়ত বয়াতি অভিযোগ করেছেন, তিনি জামিন পাবার পর তার বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন দেওয়া ব্যক্তিবর্গ একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর নেয়ার জন্য তাকে চাপ প্রয়োগ করেন; তারা বলেন, তিনি যদি ক্ষমা চান এবং গান-বাজনা ছেড়ে দেন, তাহলে মামলা তুলে নেয়া হবে। মামলার পটভূমি এবং মামলা পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ব্যবহার করে শরিয়ত বয়াতিকে হেনস্তা এবং তার গান বাজনা বন্ধ করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

## বাউল সঙ্গীত

লোকগানের একটি ধারা যা মূলত বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এ গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই গানকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাউল গানের কথা ও সুর আধ্যাত্মিক ঘরানার, মানুষকে তার ভেতরেই সৃষ্টিকর্তাকে অন্বেষনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। একারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহ বাউল সঙ্গীতের বিরোধিতা করে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও গোষ্ঠীসমূহের উত্থানের সাথে সাথে বাউল সঙ্গীত শিল্পিদের বিরুদ্ধে শারীরিক আক্রমণ, হুমকি ও মামলা দায়ের বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাউল সঙ্গীত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমে মতপ্রকাশের এক অনবদ্য মাধ্যম। চরম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাউল শিল্পিরা তাদের সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশে মতপ্রকাশের চর্চাকে জারি রাখার চেষ্টা করছেন।

বাউল গানের অনুষ্ঠান

# টার্গেট: রিতা দেওয়ান

*পালাগানের আসরে সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে 'বাহাস' করেছিলেন রিতা দেওয়ান। ওই গানের বিশেষ অংশ নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করে ভূয়া ফেসবুক একাউন্ট থেকে তা ইউটিউবে আপলোড করা হয়। এরপর ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে লোকশিল্পী রিতা দেওয়ানের বিরূদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট চারটি মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে তিনটি হয় দণ্ডবিধিতে, আর ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সাইবার ট্রাইবুন্যালে একটি মামলা করা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। মামলার বাদি ইমরুল হাসান নামের একজন আইনজীবী। দীর্ঘদিন পালিয়ে বেড়ানোর পর ঢাকার সাইবার ট্রাইবুন্যালে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান রিতা দেওয়ান। এই মামলার কারণে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি। একজন নারী হিসেবে লুকিয়ে থাকা ও পালিয়ে বেড়ানো ছিল এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও তার গানের অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া যায় না । ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনাল রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে এবং তার মামলা চলামান রয়েছে।*

রিতা দেওয়ান একজন বাউল, বয়াতি গানের জন্য পরিচিত দেওয়ানদের শিষ্য। গুরুর কাছ থেকে দেওয়ান উপাধির কারনে তিনি রিতা দেওয়ান নামে পরিচিতি পেয়েছেন।

বাংলাদেশের বাউল শিল্পীরা সাধারণত গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ ও মনের খোরাক মিটিয়ে থাকেন। বাউল গানে মানবতা, আধ্যাত্মিকতা, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, জীবনাচরণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বাউল সঙ্গীতকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর রিতা দেওয়ান টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে একটি পালা গানের অনুষ্ঠান করেন। এ ধরণের পালাগানে দু'জন গায়ক গানের মাধ্যমে বিতর্ক করেন। একজন থাকেন মানুষের ভূমিকায়, অন্যজন স্রষ্টার।

সেই পালাগান অনুষ্ঠানে রিতা দেওয়ান মানুষের এবং তার সহযোগী শিল্পী শাহ আলম সরকার স্রষ্টার ভূমিকায় ছিলেন। এ গানের নির্বাচিত কিছু অংশ জোড়া লাগিয়ে 'কেয়ামনি' নামের একটি ভূয়া অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন, ফেসবুক, ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর রিতা দেওয়ানে বিরুদ্ধে পালাগানের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী ও অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ার প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় মামলা দায়ের হয়। একটি মামলা হয় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে, একটি চট্টগ্রামে এবং অন্য দুটি মামলা দায়ের হয় ঢাকায়। এই চারটি মামলার মধ্যে একটি মামলা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৮ ধারায়, যার বাদী মোঃ ইমরুল হাসান। অন্য মামলাগুলো করা হয় দন্ডবিধির ২৯৫-এক ধারায়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বাদী মোঃ ইমরুল হাসান দাবি করেন, রিতা দেওয়ান পালাগানের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ) প্রতি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা বাদীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। ঢাকায় সাইবার ট্রাইব্যুনালে ২০২০ সালের ২ ফ্রেব্রুয়ারি মামলা দায়েরের পর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই বছরের ২ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এরপর থেকে রিতা দেওয়ান বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি উচ্চ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান।

মামলাসমূহের বাদীদের সাথে রিতা দেওয়ানের কোনো পূর্ব-পরিচয় ছিলো না এবং এদের কেউই তার করা পালাগানের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখেননি। পুলিশ ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর এই মামলার অভিযোগপত্র দেয়

এবং ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল তা গ্রহণ করে। এ মামলায় রিতা দেওয়ানের পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল, কোকিল টিভি ও রুপালি এইচডি'র মালিকবৃন্দ শাহজাহান ও মোঃ ইকবাল হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। এ মামলায় অভিযুক্ত তিনজনই জামিনে আছেন।

রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পরপরই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা শুরু হয় । 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করে তাঁকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। রিতা দেওয়ানের মতো একজন বাউল শিল্পীর জন্য গান বাজনা তার জীবিকা নির্বাহ ও পরিবারের ভরণপোষণের প্রধান উপায়। একজন নারী বাউলশিল্পীর বিরুদ্ধে মৌলবাদী চিন্তাধারা প্রসূত মনোভাব ও আচরণের কারনে তার গান গাওয়া ও চর্চা এখন একরকম প্রায় বন্ধ। তার গানের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা– ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয়া হয় না। এই মামলার ফলে তিনি সামাজিকভাবে যেমন হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন তেমনি তার শিল্পীসত্ত্বাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রিতা দেওয়ানের বিরুদ্ধে মামলার ফলে তার পুরো পরিবারকে নানাভাবে হুমকি, হয়রানি ও ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে।

- বাউল শিল্পী হিসেবে রিতা দেওয়ানের গান-বাজনা বন্ধ করতেই এই মামলা দেয়া হয়।
- তাঁর অংশ নেয়া একটি পালাগানের খন্ডিত অংশ সম্পাদনা করে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে একই বিষয়ে আরও তিনটি মামলা হয়েছে।
- বাদী রিতা দেওয়ানকে চেনেন না, তাঁর গানের অনুষ্ঠানও দেখেননি, কিন্তু ঐ ভিডিও দেখে তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলে এ মামলা করেন।
- গ্রেফতারের ভয়ে রিতা দেওয়ানকে আত্মগোপনে থাকতে হয়।
- মামলা হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে পোস্টারিং করে তাঁকে নাস্তিক বলে অভিহিত করা হয়, আটকের দাবী করা হয়, এমনকি হত্যারও হুমকি দেয়া হয়।
- প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁর গানের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয় না।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

# টার্গেট: রুহুল আমিন

*খুলনায় পাটকল শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আলোচনায় আসেন রুহুল আমিন। আন্দোলন দমন করার কৌশল হিসেবে রুহুল আমিনের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পুলিশ তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওইদিন রাতেই তাঁকে আটক করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ আদালতে হাজির করে তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে রুহুল আমিনকে মানসিক নির্যাতন করা হয়; কারাগারে তাঁকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয় এবং সেখানে তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। পুলিশ তদন্তের কথা বলে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা নেয়। দুই দফা জামিন আবেদন নাকচ হওয়ার পর অবশেষে ২০২১ সালের ১৯ এপ্রিল রুহুল আমিন কারাগার থেকে মুক্তি পান। তাঁকে আটক ও রিমান্ডে নেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন স্থগিত হয়ে যায়। রুহুল আমিন এখনো সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকেন এবং আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন প্রায়ই তাকে প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি প্রদান করে।*

মোঃ রুহুল আমিন খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার প্রত্যন্ত গ্রাম রামনগরের একটি কৃষক পরিবারের সন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন; বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ২০১৪ সালে তিনি খুলনায় গিয়ে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা শুরু করেন। সাম্প্রতিক সময়ে পাটকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম একজন তরুণ নেতৃত্ব হিসেবে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন।

রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করে পুলিশ, যেখানে অভিযোগকারী পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোঃ নাহিদ হাসান মৃধা। মামলা দায়েরের সময় তিনি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

রুহুল আমিন জানান, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি খুলনায় পাটকল শ্রমিক আন্দোলেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১ জুলাই ২০২০ সরকার রাষ্ট্রয়াত্ত ২৫টি পাটকল বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে শ্রমিকদের চাকরি এবং তাদের পাওনা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু পাটকলগুলোর বেশিরভাগ সিবিএ নেতা সরকার দলীয় হওয়ায় এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও চাপ থাকায় তারা বিষয়টি নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। করোনকালীন এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রুহুল আমিন পাটকল শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একের পর এক কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। হাজার হাজার শ্রমিকের অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হয়, যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলমান ছিলো।

এরই মধ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক আরেকজন ভুক্তভোগী লেখক মুশতাক আহমেদ কারাগারে থাকা অবস্থায় মারা যান। মুশতাক নয়মাসেরও বেশি সময় কারাগারে আটক ছিলেন। তার জামিন আবেদন কয়েকবার নাকচ করে দেয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া উল্লেখ করলেও তার আত্মীয়-স্বজনদের আশংকা- হেফাজতে নির্যাতনের কারণে তার মৃত্যু হয়। মুশতাক আহমেদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন পরিচয় না থাকলেও এই ঘটনা রুহুল আমিনকে একই সঙ্গে

আবেগতাড়িত এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে এ ধরণের মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের সমালোচনা করে এবং প্রতিবাদী কর্মসূচি পালনের আহবান জানিয়ে ফেসবুকে দুইটি পোস্ট দেন।

ফেসবুকে দেওয়া পোস্ট দুইটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার এজাহার এবং অভিযোগপত্রে পোস্ট দুইটিকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, (১) 'একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড। এরপর একটি সমাবেশ-মিছিল-মানববন্ধন!!আর কতকাল? আসেন নতুন কিছু করি।।' এবং (২) 'আর কালবিলম্ব নয়, এবার সবাই ঢাকা চল, সংসদ ভবন ঘেরাও কর। দলাদলি পরে হবে, সবার আগে লড়াই হবে। হাসিনা সরকার ও রাষ্ট্র কর্তৃক মুশতাক হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ অভিমুখে লাশের মিছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল কর নইলে মোদের গ্রেফতার কর। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১। শনিবার। সকাল ১১টা জমায়েত: শাহবাগ মোড়। মোশতাক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনগণ'।

- শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়ায় রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন বানচাল করতে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে এই মামলা দেয়া হয়।
- তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ, কারা হেফাজতে লেখক মোশতাকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রুহুল আমিনের দেয়া ফেসবুক পোস্টকে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- জিজ্ঞাসাবাদে পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, তাঁর ফেসবুক পোস্ট নিয়ে তেমন কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।
- আটককারী পুলিশ কর্মকর্তারা রুহুল আমিনকে বলেন, 'উপরের নির্দেশে' তার বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে।
- কারাগারে তাঁকে ডান্ডাবেরি পরিয়ে রাখা হয়, এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে কয়েকদিন কালক্ষেপণের পর তাকে চিকিৎসা দেয়া হয়।
- জামিন পাওয়ার পূর্বে প্রায় দুইমাস কারাভোগ করেন।
- সার্বক্ষণিক নজরদারীর মধ্যে রয়েছেন এবং আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিয়ে হুমকী দেয়া হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ফেসবুকে পোস্ট দুটি দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশের ১৮-২০ জনের একটি দল একাধিক মাইক্রোবাস নিয়ে খালিশপুরে রুহুল আমিনের ভাড়া বাসায় পৌঁছে যায়। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান, এমন কথা বলে তাকে বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়। শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের অক্টোবরের মধ্যে তিনি তিনবার পুলিশের হাতে আটক হলেও কোনবারই তার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি এবং তাকে কারাগারেও যেতে হয়নি। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে ২০২১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি খুলনার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে তার পাঁচ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ।

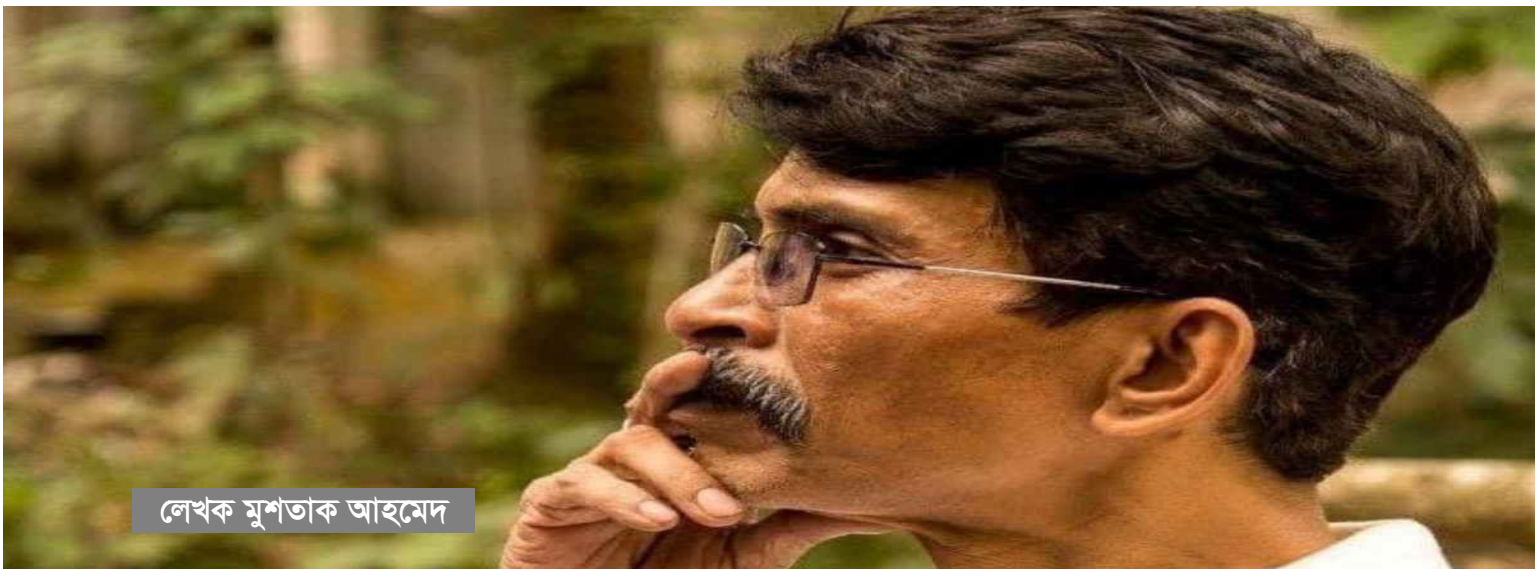

লেখক মুশতাক আহমেদ

২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে তুলে নেয়া হলেও ২৭ ফেব্রুয়ারি তাকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ এজাহারে উল্লেখ করে। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রুহুল আমিন বলেন, পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের পেছনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ইন্ধন রয়েছে কিনা, আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস কি এসব প্রশ্ন করা হয়। রিমান্ডে তাকে শারীরিক নির্যাতন না করা হলেও, ব্যক্তিগত এবং অপ্রীতিকর-অসঙ্গতিপূর্ণ নানা প্রশ্ন করে তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। রিমান্ড শেষে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুইবার জামিনের আবেদন বাতিল হওয়ার পর তৃতীয়বারের চেষ্টায় ১৯ এপ্রিল ২০২১ তিনি জামিন পান এবং কারাগার থেকে মুক্ত হন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলায় দেড় মাসেরও বেশি সময় কারাগারে থাকা অবস্থায় রুহুল আমিন শারীরিকভাবে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি জানান, আগে থেকেই তার সাইনাসের সমস্যা ছিল। কিন্তু কারাগারের নোংরা পরিবেশ ও ধুলোবালিময় মেঝেতে শুয়ে থাকার জন্য তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা তৈরি হয় এবং তা এক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। জেল কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তারা চিকিৎসা দিতে কালক্ষেপন করে। অবশেষে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায়। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি জন্ডিসেও আক্রান্ত হন।

রুহুল আমিন জানান, তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশ তার সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার গ্রামের বাড়িতে যায়। বাড়িতে, বিশেষভাবে গ্রামে কারো বাড়িতে পুলিশ যাওয়াটা একটা বেশ ভীতি বা আতঙ্কের বিষয়। বাড়িতে পুলিশ যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং গ্রেফতার ও রিমান্ডের কথা শুনে তার মা অসুস্থ হয়ে পরেন। রুহুল আমিন দাবি করেছেন যে, পুলিশ এসময় তার পরিবারের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে।

রুহুল আমিন বলেন, তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলা দেওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন। তাকে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে ভীতি-আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে তার অনুপস্থিতিতে প্রায় দুই মাস আন্দোলন স্থগিত থাকে। এই সময়ের মধ্য সরকার পাটকলগুলো বন্ধ ও মালিকানা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

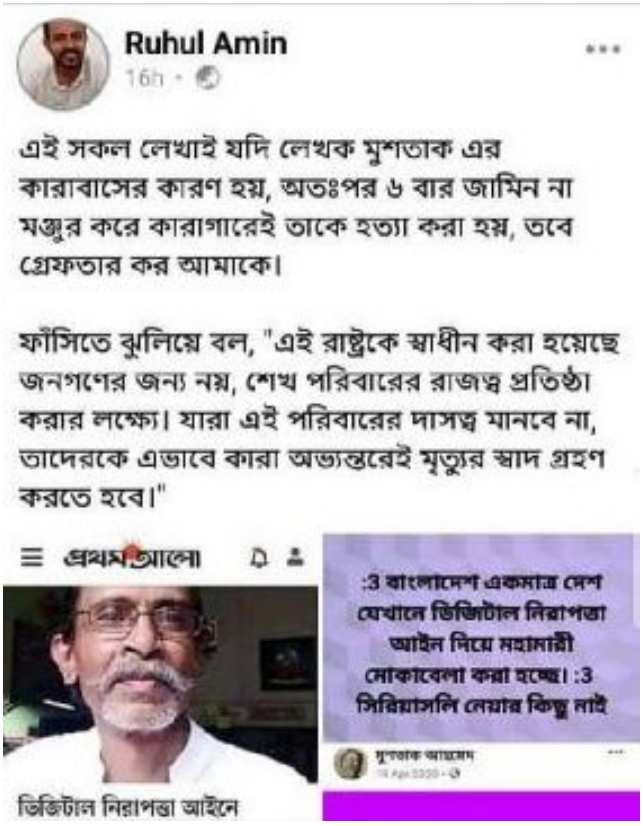

আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত থাকার জন্য রুহুল আমিন আগে থেকেই পুলিশ প্রশাসনের নজরদারিতে ছিলেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলা এবং কারাবাসের পর সেই নজরদারি আরো বেড়ে গেছে। রুহুল আমিন ধারণা করেন, তিনি এবং শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত তার অন্য সহ-সংগঠকরা ফোন, ম্যাসেঞ্জার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নজরদারির মধ্যে আছেন। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন প্রায়ই তাকে বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মসূচি পালন বা আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেয়া থেকে বিরত থাকতে প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি বা সাবধানবাণী দিয়ে থাকে।

২৬ এপ্রিল ২০২১-এ মামলার অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। এতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫(২) এবং ৩১(২) ধারায় অভেযুক্ত করা হয়েছে। ২৫(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।' ২৫(১) ধারায় অপরাধ সম্পর্ক বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে,-(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা (খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুন্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।' ৩১(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন বা করান, যাহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অথবা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় বা ঘটিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।'

রুহুল আমিন দাবি করেন, ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সরকারপ্রধান বা অন্য কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি; তিনি কারাগারে আটক বা রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা একজন ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার সমালোচনা করেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, তার পোস্টে 'শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি' বা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট' হওয়ার মতো কিছুই নেই। তিনি বলেন, অসঙ্গতিপূর্ণ, ভিত্তিহীন দুইটি অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

রুহুল আমিনের ভাষ্যমতে, গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে বলেছেন, 'হাইকমান্ডের' নির্দেশে তাকে গেফতার করা হয়েছে। রিমান্ডেও তারা তার ফেসবুক পোস্ট নিয়ে খুব বেশি কিছু জানতে চাননি; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আরো দুই ভুক্তভোগী মুশতাক ও কিশোরের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কিনা, এটাই ছিল তাদের প্রধান প্রশ্ন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে পাটকল শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। এ কারণে রুহুল আমিন মনে করেন, তার ফেসবুক

পোস্টগুলো তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের দৃশ্যমান কারণ হলেও, প্রকৃতপক্ষে পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন দমানোই ছিল উদ্দেশ্য। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তার বিরুদ্ধে এই মামলা সেই উদ্দেশ্য সাধনেই ব্যবহৃত হয়েছে।

রুহুল আমিন বলেছেন, তার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের এবং তার গ্রেফতার, জেলে থাকা ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে পরিবারের ওপর। তার ভাইয়ের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, বোন শঙ্কিত যে তার ছেলের হয়তো ভবিষ্যতে চাকরি পেতে অসুবিধা হবে। নিজের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার পাশাপাশি তিনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে সমালোচনা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে তা বাতিলের দাবি জানান।

রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকল বন্ধের বিরুদ্ধে পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন

# টার্গেট: শাহনেওয়াজ চৌধুরী

*চট্রগ্রামের বাঁশখালীতে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে ফেসবুক পোস্ট দেয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও তরুণ প্রকৌশলী শাজনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয় ২০২১ সালের ২৭ মে। পুলিশ ২৮ মে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে। প্রায় তিন মাস কারাগারে থেকে ১৬ আগস্ট তিনি জামিনে মুক্তি পান। ২০২১ সালের ৩০ অক্টোবর পুলিশ তার বিরুদ্ধে আভিযোগপত্র দিয়েছে। এই মামলা ও কারাবাসের কারণে শাহনেওয়াজ চৌধুরী তার চাকরি হারান, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তার পিতা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মামলার পর থেকে তিনি লেখালেখি বা সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে শঙ্কা বোধ করেন। মামলায় হাজিরা দেয়া ও মামলার খরচ বহন করতে গিয়ে তিনি আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।*

শাহনেওয়াজ চৌধুরী পেশায় একজন প্রকৌশলী হলেও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চট্রগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা গ্রামে তার স্থায়ী আবাস। পেশাগত এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করলেও তিনি সব সময় তার নিজ এলাকার খোঁজখবর রাখতেন এবং এলাকাবাসীর সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুকেও তিনি এসব নিয়ে তৎপর ছিলেন।

শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২৭ মে ২০২১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাটি করেন এস আলম গ্রুপের বাঁশখালী প্রজেক্টের প্রধান সমন্বয়কারী ফারুক আহমদ। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী অনুযায়ী, তার স্থায়ী নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চিলাকাড়া গ্রামে।

এই মামলার বাদী ও বিবাদী পরস্পরের পরিচিত নন এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন বিরোধ বা শত্রুতাও ছিল না। মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, তিনি বিবাদীকে চিনতেন না এবং স্থানীয় এক চৌকিদারের মাধ্যমে নাম ঠিকানা জেনে তারপর তিনি এই মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে বাদী অভিযোগ করেন, শাহনেওয়াজ চৌধুরী ফেসবুকে দেওয়া তার পোস্টের মাধ্যমে গন্ডামারা ইউনিয়নে নির্মানাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এসএস পাওয়ার-১ লিমিটেডের প্রতি 'এলাকার মানুষের শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার, এলাকার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও জনমত সৃষ্টি করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর লক্ষ্যে... লোকজনকে প্ররোচিত করেছে।'

ফেসবুকে দেওয়া যে পোস্টের কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, সেখানে বাঁশখালীর কয়েকটি ছবি দিয়ে শাহনেওয়াজ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'ব্রেকিং নিউজ! টুয়েলভ মার্ডারের (১২ খুনের) পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে বাঁশখালীর মানুষ মনে করেছিল গন্ডামারা ইউনিয়ন

সাইক্লোন যশ-এর আঘাতে প্লাবিত গ্রাম

উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। আজ দেশের মানুষ প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাচ্ছে গন্ডামারাবাসী জোয়ারের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। বাঁশখালীর তরুণ ও যুব সমাজকে সাহসী লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং উন্নয়নের পক্ষে ভূমিকা রাখতে হবে নির্ভয়ে।' শাহনেওয়াজ চৌধুরী বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর প্রভাবে বাংলাদেশের বেশ কিছু উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয়। এর ফলে বাঁধ ভেঙ্গে বাঁশখালীর কয়েকটি গ্রামে পানি ঢুকে যায় এবং মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ ঘটনার পর বাঁশখালীর প্লাবিত অঞ্চলের কয়েকটি ছবি সহকারে ২০২১ সালের ২৬ মে তিনি ফেসবুকে ওই পোস্ট দিয়েছিলেন।

এই মামলার প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে পূর্বের কিছু ঘটনাবলীর দিকে আলোকপাত করতে হবে। বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি একটি বহুল আলোচিত-সমালোচিত প্রকল্প। বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী শিল্পগোষ্ঠী এস. আলম গ্রুপ চীনের SEPCOIII Electric Power Construction Corporation এবং HTG Development Group এর সাথে যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। জমি অধিগ্রহণ এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে পরিবেশের সম্ভাব্য ক্ষতির কথা বিবেচনা করে শুরু থেকেই এলাকাবাসী এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। গন্ডামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে 'বসতভিটা ও গোরস্থান রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। শাহনেওয়াজ চৌধুরী জানান, তিনি তখন থেকেই এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং তরুণ ও ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই আন্দোলন দমাতে গিয়ে ২০১৬ ও

- কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে ফেসবুক পোষ্ট দেওয়ায় শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা হয়।
- যে কোম্পানী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করছে, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে তারাই মামলা করে।
- মামলা ও কারাগারে থাকার কারনে শাহনেওয়াজ চৌধুরী চাকুরি হারান, তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।
- জামিনে মুক্তি পাবার পূর্বে প্রায় তিনমাস কারাভোগ করেন।
- সামাজিক কর্মকান্ড ও লেখালেখি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন।

২০১৭ সালে পুলিশ মোট পাঁচ জনকে গুলি করে হত্যা করে। পরবর্তীতে এস. আলম গ্রুপের পক্ষ থেকে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন ও এলাকাবাসীকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; পাশাপাশি আন্দোলনের নেতা লিয়াকত আলী এস. আলম গ্রুপের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায় এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলতে থাকে।

২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল নির্মানাধীন বিদ্যুৎ প্রকল্পের শ্রমিকদের বিক্ষোভে 'বন্দুকধারীদের' গুলিতে সাত শ্রমিক নিহত হয়। এরপর ২৬ মে ২০২১ ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর প্রভাবে গন্ডামারাসহ বাঁশখালীর কিছু এলাকা প্লাবিত হয়। এরকম অবস্থায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে হতাহতের ঘটনা, এলাকাবাসীর দুর্ভোগ এবং তাদের আকাঙ্খিত উন্নয়ন না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরতে শাওনেওয়াজ চৌধুরী ফেসবুকে ওই পোস্টটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়নের কথা বলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মান করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। এই প্রকল্পের কারণে সমুদ্র তীরবর্তী ঝাউবনসহ অন্যান্য গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে, বেড়িবাঁধ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর ফলে যেকোন ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় জোয়ারের পানি আগের চেয়ে অনেক দ্রুত গ্রামগুলোকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। এই সত্য কথাগুলো ফেসবুকে লেখাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ২০২১ সালের ২৮ মে গভীর রাতে ( ২৯ মে ভোর) শাহনেওয়াজ চৌধুরীকে নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন তাকে বাঁশখালীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তার জামিনের আবেদন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় তিন মাস কারাগারে থাকার পর তিনি ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ জামিনে মুক্ত হন।

মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী অনুসারে, শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৯ ও ৩১ ধারায় ফেসবুকে আক্রমনাত্মক, মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করে বিদ্বেষ, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তিনি যেমন কোন মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত দেননি, তেমনি ফেসবুকে তার পোস্টটিও আক্রমনাত্মক ছিল না বা অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মতো কিছু ছিল না। শাহনেওয়াজ চৌধুরী বলেন, তিনি ওই পোস্টে অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু লিখেননি, বরং এলাকাবাসীর দুর্ভোগ লাঘবের জন্য, এলাকার উন্নয়নের জন্য তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শেষে ৩০ অক্টোবর ২০২১ শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বাঁশখালীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র পেশ করেছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল নির্মানাধীন বিদ্যুৎ প্রকল্পের শ্রমিকদের বিক্ষোভ এবং হতাহতের ঘটনার পর দুইটি মামলায় অজ্ঞাতনামা সাড়ে তিন হাজার গ্রামবাসীকে আসামী করা হয়। এ ঘটনার পর ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের করা রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গন্ডামারার গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বা অন্য কোনভাবে হয়রানি না করার জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এই নির্দেশ অমান্য করেই পুলিশ শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা নেয় এবং তাকে গ্রেফতারও করে। শাহনেওয়াজ চৌধুরীর আইনজীবী এ ঘটনাকে আদালত অবমাননা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। এই আইনজীবী অভিযোগ করেন, এস. আলম গ্রুপ একটি ক্ষমতাশালী এবং 'সরকারঘনিষ্ঠ' শিল্পগোষ্ঠী। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে তারা শাহনেওয়াজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই মামলা দিয়েছে। তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র এই ফেসুবক পোস্টের

জন্য নয়, নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে শাহনেওয়াজ চৌধুরীর সম্পৃক্ততার জন্যও হয়রানিমূলক এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। এই আইনজীবী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি প্রভাবশালীদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি একে 'নিবর্তনমূলক' হিসেবে অভিহিত করে দ্রুত তা বাতিলের আহবান জানান।

এই মামলা এবং কারাবাসের ফলে শাহনেওয়াজ চৌধুরী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় তড়িৎ প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন, কারাগারে যাওয়ার পর তার সেই চাকরিটি চলে যায়। চাকরির পাশাপাশি তার নিজস্ব কিছু ব্যবসা ছিল, তার অনুপস্থিতিতে সেই ব্যবসাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। শাহনেওয়াজ চৌধুরী কারাগারে যাওয়ার সাতদিনের মাথায় তার বাবা মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের ফলে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। অপরদিকে দুই শিশু সন্তান নিয়ে তার স্ত্রীও এসময় ভীতি, আতঙ্ক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে দিন পার করেন। এরকম অবস্থায় শাহনেওয়াজ চৌধুরী নিজেও শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, জামিন পেলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলার কারণে তিনি ব্যক্তিগত, পেশাগত পারিবারিকভাবে ভয়ংকর ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন এবং সামাজিকভাবে তার সম্মানহানি হয়েছে। তাকে এখনো এক-দুই মাস অন্তর আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে, মামলার খরচ বহন করতে হচ্ছে। শাহনেওয়াজ চৌধুরী বলেন, এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং করুণ অভিজ্ঞতার কারণে তিনি এখন এলাকার ভালমন্দ নিয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে শঙ্কা বোধ করেন, অনেক বেশি সতর্ক থাকেন এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

বাঁশখালীর গেন্ডামারা ইউনিয়নে নির্মাণাধীন কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র

# টার্গেট: মুমিতুল মিম্মা

*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুমিতুল মিম্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চক্ষুশুল হয়ে ছিলেন। ২০১৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন মিম্মার বিরূদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মূলত আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর স্থানীয় একজন সরকারদলীয় নেতা মিম্মার বিরূদ্ধে এই মামলা করেন। ১০ দিন পালিয়ে থাকার পর মিম্মা ১৮ নভেম্বর উচ্চ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান। দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকতে গিয়ে মিম্মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগহীনতায় এবং দুশ্চিন্তায় তা মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই মামলার কারণে মিম্মা নানাভাবে হেনস্তা হয়েছেন। একজন নারী হিসেবে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য বাজে মন্তব্য, অশ্লীল কটুক্তি ও হুমকির শিকার হন, চাকুরি পাবার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এবং তার শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্থ হয়। মিম্মা এখনও সার্বক্ষণিক ভীতি ও নজরদারির মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন।*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুমিতুল মিম্মা ক্যাম্পাসের আন্দোলন-সংগ্রামের এক পরিচিত মুখ। ২০১৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দূর্নীতি ও অনিয়মের বিরূদ্ধে ছাত্র-শিক্ষকদের জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ২০১৮ সালে যখন কোটাবিরোধী আন্দোলন এবং সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন সংঘটিত হয়, তখনও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে উপাচার্যের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। মুমিতুল মিম্মা এসব আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কারণে উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের চক্ষুশুল ছিলেন। ২০১৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ৭ নভেম্বর ২০১৯ মিম্মা ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন: 'হে হে হে মাদার অব অল ক্ষেপেছে- চাবুক ছুড়ে মেরেছে'। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বেয়াদবি করলে ফল ভালো হবে না, প্রধানমন্ত্রী এমনটা বলেছেন বলে উপাচার্য সমর্থকদের দেয়া ফেসবুক পোস্টের জবাবে মিম্মা ওই কথাটি লিখেছিলেন। এরপর উপাচার্যের একটি গ্রাফিতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়, যেখানে তাকে পুরুষতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর মিম্মা ওই গ্রাফিতি তার ফেসবুকে শেয়ার করেন।

এর পরপরই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওইদিনই মিম্মার বিরূদ্ধে আশুলিয়া থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫ ধারায় মামলা করেন সাভার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শাহাদাৎ হোসেন খান। বাদী এবং মিম্মা একে অন্যের অপরিচিত। মামলার এজাহারে বাদী অভিযোগ করেন যে, মিম্মা তার ফেসবুক পেইজে পোস্ট করা বিভিন্ন লেখা ও ছবির মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভয়ভীতির সঞ্চার করেছেন। তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছেন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছেন। বাদী আরো অভিযোগ করেন যে, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মিম্মা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক এবং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে বাদী সংক্ষুব্ধ বোধ করে এই মামলা দায়ের করছেন।

তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে বা হতে পারে এমন আশঙ্কার কথা পরিচিতজনদের মাধ্যমে জানতে পারেন মিম্মা। এরপর চরমভাবে আতঙ্কিত হয়ে তিনি আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করেন। ইতোমধ্যে তার বিরূদ্ধে মামলা হওয়ার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে সামাজিক মাধ্যমে গণগালিগালাজ ও হুমকি দেয়া শুরু হয়। পরিচিতজন অনেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগে অনীহা ব্যক্ত করে। এমনকি আন্দোলনকারীরাও বিবৃতি দেয় যে, এটা মিম্মার ব্যক্তিগত অভিমত এবং তারা কোন দায় গ্রহণ করবে না। এসবের ফলে মিম্মা কার্যত একা হয়ে পড়েন। এদিকে লুকিয়ে থাকার প্রয়োজনে তিনি তার ফোন নাম্বার বদলে ফেলেন এবং পরিচিতজনদের সাথে যোগাযোগ সীমিত করে ফেলেন। মিম্মার মা একজন ‘সিঙ্গেল মাদার’, মিম্মা তার একমাত্র সন্তান। মিম্মার বিরূদ্ধে মামলা হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং মিম্মার সাথে যোগাযোগহীনতায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিম্মা টিউশনি করে যে আয় রোজগার করতেন, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে তার লুকিয়ে থাকার জায়গাও জন্য সীমিত হয়ে আসে। তিনি প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। এসবের ফলে মিম্মা মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েন। ১০ দিন পালিয়ে থাকার পর ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর উচ্চ আদালতে হাজির হন মিম্মা। আদালত তাকে দুই সপ্তাহের জামিন প্রদান করে। আইনজীবীদের আশঙ্কা ছিল যে, উচ্চ আদালতে উপস্থিত হবার আগেই তাকে আদালত চত্বর থেকে গ্রেফতার করা হতে পারে অথবা জামিন না দিয়ে তাকে হাজতে পাঠানো হতে পারে। গ্রেফতার এড়াতে মিম্মা বোরখা পরে আদালতে উপস্থিত হন।

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দূর্নীতি ও অনিয়মবিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে এ মামলা করা হয়।
- স্থানীয় একজন সরকারদলীয় নেতা এ মামলা করেন, তবে তিনি মিম্মাকে বলেছেন যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্দেশে তিনি এ মামলা করেছেন।
- মামলা হওয়ার খবর জানার পর প্রায় দশদিন মিম্মা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে থাকেন। এ সময় তিনি শারিরীক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।
- মামলার কারনে তার শিক্ষাজীবন ব্যহত হয়, চাকুরি পেতেও অসুবিধা হয়।
- মামলার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য বাজে মন্তব্য, অশ্লীল কটূক্তি ও হুমকীর শিকার হয়েছেন।
- সার্বক্ষণিক নজরদারীর মধ্যে রয়েছেন।

পরবর্তীতে মিম্মা তার মামলার বাদীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাদীকে দিয়ে মামলাটি প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন। বাদী মিম্মাকে বলেছেন, তিনি আসলে মিম্মার ফেসবুক পেইজ দেখেননি। তাকে উচ্চ পর্যায় থেকে এ মামলা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিম্মার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও জানান যে, তার পক্ষে মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব না, যদি না উচ্চ পর্যায় থেকে তা করতে বলা হয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলা হওয়ার কারণে মিম্মা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার জন্য চাকুরি পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করে একটি সংবাদমাধ্যমে কাজের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেখানেও সহকর্মীরা প্রায়ই তাকে মনে করিয়ে দেন যে, তার মামলার বিষয়ে তারা জানেন এবং এটা এমনভাবে বলা হয় যে, যেন মিম্মা একজন অপরাধী। মিম্মা মনে করেন, তিনি প্রতিনিয়ত নজরদারীর মধ্যে রয়েছেন। অপরিচিত লোকজন প্রায়ই তার কাছে এসে বলে, তারা জানেন যে মিম্মা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তারা তার ফোন নাম্বারও জানতে চান।

শিক্ষার্থী মিম্মার বিরূদ্ধে এ মামলা এবং তার পরম্পরা বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে, আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আন্দোলনকে স্থিমিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারদলীয় নেতাকে দিয়ে মিম্মার বিরূদ্ধে এই মামলা করায়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়ালচিত্র

# টার্গেট: তানভীর হাসান

*তানভীর হাসান ঠাকুরগাঁও জেলার একজন সাংবাদিক। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক-এর জেলা প্রতিনিধি। এছাড়াও বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকা এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তিনি ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবের সদস্য। ঠাকুরগাঁও সদর হাসাপাতালে করোনা রোগীদের জন্য খাবার বরাদ্দে অনিয়ম বিষয়ে একটি অনলাইন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের জন্য ঐ হাসপাতালের সুপারেনটেনডেন্ট তানভীর হাসানের বিরূদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫ ধারায় মামলা করেন ৮ জুলাই ২০২১। বিভিন্ন মাধ্যমে মামলার কথা জানতে পেরে ১০ জুলাই ২০২১ রাতে তানভীর ঠাকুরগাঁও সদর থানায় মামলা আদৌ হয়েছে কিনা এই খবর নিতে গেলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সারারাত তাকে থানা হাজতে আটকে রাখা হয়। থানা হাজতে তানভীর হাসান অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরদিন ১১ জুলাই ২০২১ হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় তাকে আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানালেও আদালত রিমান্ড নামঞ্জুর করে তানভীর হাসানকে জামিন প্রদান করে।*

তানভীর হাসান পেশায় একজন সাংবাদিক। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার হাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তানভীর হাসান ২০০৭ সাল থেকে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তিনি ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবের একজন সদস্য। তিনি বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে জেলার প্রতিনিধি হিসেবেও যুক্ত আছেন।

তানভীর হাসান ৫ জুলাই ২০২১ তারিখে একটি অনলাইন পোর্টালে স্থানীয় হাসপাতালের করোনা রোগীদের বরাদ্দে অনিয়ম বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এই প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে তার বিরূদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫ ধারায় ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বাদী হলেন ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা: নাদিরুল ইসলাম আজিজ। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী অনুযায়ী সাংবাদিক তানভীর হাসান অপর এক অনলাইন পোর্টালের সংবাদদাতা রহিম শুভ'র সাথে যোগসাজসে ওয়েব সাইটের ডিজিটাল বিন্যাসের মাধ্যমে মিথ্যা, মানহানিকর তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করে মানহানি ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

- সাংবাদিক তানভির হাসান হাসপাতালে করোনা রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অনিয়ম বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে মামলা করে।
- স্থানীয় থানায় সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গেলে পুলিশ তাকে আটক করে এবং সারারাত থানা হাজতে আটকে রাখে।
- হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করলে আদালত পুলিশকে ভর্ৎসনা করেন।

তানভীর হাসান ১০ জুলাই ২০২১ তারিখে রাতে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় যান এলাকায় সংঘটিত অন্য একটি মারামারির তথ্য সংগ্রহ করতে। তখন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরপরই পুলিশ তার মুঠোফোন নিয়ে নেয়, তাকে পরিবার বা আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলতে দেয়া হয়নি। তানভির হাসানের অন্য সহকর্মীরা তার গ্রেফতারের বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে। ওই রাতে তানভির হাসানকে থানাতেই আটক রাখা হয়। গভীর রাতে তানভির বুকে ব্যাথা অনুভব করলে কর্তব্যরত পুলিশকে অনুরোধ করেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে। উল্লেখ্য, ভানভির এর কিছুদিন আগেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অনেক অনুরোধের পর পুলিশ তাকে রাত দেড়টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে তাকে বেডের সঙ্গে হাতকড়া পড়িয়ে রাখা হয়। পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত কোন ডাক্তার বা নার্স তাকে দেখতে আসেনি বা তার কোন খোঁজ খবর নেননি। পরিবারের সদস্যদেরও তার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি। পরদিন সকাল ১১টার দিকে একজন ডাক্তার তাকে দেখে কিছু জরুরি চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য নার্সদের নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন চিকিৎসা সেবা পাওয়ার আগেই পুলিশ তাকে আদালতে নিয়ে যায়। তানভির মনে করেন, যে হাসপাতালের অনিয়ম নিয়ে তিনি সংবাদ প্রকাশ করেছেন, সেখানেই তাকে ভর্তি করানোর কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে দ্রুত চিকিৎসাসেবা প্রদান করেনি। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে ১১ জুলাই ২০২১ তারিখে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত ঠাকুরগাঁও-তে হাজির করেন। এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অপরদিকে তানভীর হাসানের রিমান্ড নামঞ্জুর চেয়ে  জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩১(১) ধারায় অভিযোগ ব্যতিত অন্যান্য অভিযোগ জামিনযোগ্য হওয়ায় তানভীর হাসান ১১ জুলাই ২০২১ এ জামিন লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তানভীর হাসান ২৭ জুন ২০২১ তারিখে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন থাকার বিষয়ে কাগজপত্র আদালতে দাখিল করা ছিল। উল্লেখ্য, ১১ জুলাই ২০২১ তানভীর হাসানের এক হাতে  হাতকড়া ও দঁড়ি দিয়ে বেঁধে থানা থেকে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। তানভীর হাসানকে কেন হাতকড়া ও দঁড়ি পরিয়ে আদালতে হাজির করা হয় সে বিষয়ে আদালত ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেন। ওই তদন্ত কর্মকর্তা একটি লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বলে তানভির শুনেছেন। কিন্তু তিনি বা তার আইনজীবী এর কোন কপি সংগ্রহ করতে পারেননি।

তানভির হাসান তানুকে আদালতে নেয়া হচ্ছে

# টার্গেট: মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

*মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক হিসেবে স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশ ও প্রশাসনের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকার কারণেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে হেনস্তা করা হয় আব্দুল কাইয়ুমকে। মামলার বাদী পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে ২০১৯ সালের ১১ মে কাইয়ুমকে গ্রেফতার করান এবং পরদিন তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ত্রিশাল থানায় মামলা হয়। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় কাইয়ুম নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁকে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়া হয়। একাধিকবার জামিনের আবেদন প্রত্যাখানের পর ২ জুলাই ২০১৯ তিনি জামিন পান। ১ আগস্ট ২০২১ তার মামলার অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। কাইয়ুমকে এখনো প্রতিনিয়ত নজরদারির মধ্যে থাকতে হয় এবং এ মামলার কারণে পেশাগত ও সামাজিকভাবে তিনি চরম ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন।*

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম একজন মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং ওয়েবসাইট ডেভলপার। তিনি ময়মনসিংহ শহরে বসবাস করেন। কাইয়ুম ২০১২ সাল থেকে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রসফায়ার, গুম, সীমান্তহত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘণের বিরুদ্ধে র‍্যালি-মানববন্ধনসহ মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই বিষয়গুলো নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

কাইয়ুমের বিরুদ্ধে ১২ মে ২০১৯ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন মোঃ ইদ্রিস খান, যিনি মোমেনশাহী ডি.এস কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং ময়মনসিংহ প্রতিদিন নামে একটি স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। ইদ্রিস খানের আরেকটি পরিচয়– তিনি ত্রিশালের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানির জামাতা।

বাদী ইদ্রিস খান ও অভিযুক্ত কাইয়ুম ছিলেন পরস্পরের পূর্ব পরিচিত এবং পেশাগত ও অন্যান্য কারণে তাদের মধ্যে পূর্বেকার বিরোধ ছিল। কাইয়ুমের ভাষ্য মতে, ইদ্রিস খানের পত্রিকায় ২০১৬ সালে কাইয়ুমের বিরুদ্ধে বেশকিছু বিদ্বেষমূলক, যেমন, তিনি প্রতারক, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে জড়িত ইত্যাদি সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে একই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই খবরগুলোর প্রত্যাহারও করা হয়েছিল। কাইয়ুমের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলার প্রেক্ষাপট এবং তার বক্তব্য থেকে দেখা যায়, তিনি ওয়েবসাইট নির্মাণের পারিশ্রমিক বাবদ বাদীর কাছে কিছু টাকা পেতেন। ১১ মে ২০১৯ বাদী তাকে তার অফিসে ডেকে নেন

- মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ পুলিশের সহযোগিতায় এ মামলা করেন।
- কাইয়ুমকে আগে আটক করা হয়, পরদিন তার বিরুদ্ধে মামলা হয়।
- পুলিশ হেফাজতে কাইয়ুকে নির্যাতন করা হয় এবং ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়া হয়।
- জামিন পাওয়ার পূর্বে প্রায় দুইমাস কারাভোগ করেন।
- লেখালেখি ও অন্যান্য মানবাধিকার কর্মকান্ড বন্ধের বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেয়া হয় বাদির পক্ষ থেকে।
- সার্বক্ষণিক নজরদারীর মধ্যে রয়েছেন।

এবং পাওনা পরিশোধের অংশ হিসেবে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) নেওয়ার প্রস্তাব করেন। কাইয়ুম বিদেশি মুদ্রায় তার পাওনা নেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। বাদীর অফিসের প্রধান ফটকের কাছে আসা মাত্রই পুলিশ সদস্যরা তাকে থামায় এবং তার কাছে বৈদেশিক মুদ্রা আছে বলে দাবি করে। তাকে তল্লাশি করে সেরকম কিছু না পাওয়া গেলেও পুলিশ তাকে আটক করে এবং বিভিন্ন স্থানে সময়ক্ষেপণ করে রাত ১০টার দিকে ত্রিশাল থানায় নিয়ে যায়।

কাইয়ুমের বক্তব্য অনুসারে, তার কাছে বৈদেশিক মুদ্রা না পাওয়ার বিষয়টি পুলিশ কর্মকর্তারা সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানিকে অবহিত করেন। এরপর তারা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলা দেওয়া যায় কিনা, সেই চেষ্টায় তার কাছ থেকে তার মোবাইল, ইমেইল ও ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড নিয়ে নেন। কাইয়ুম বলেন, তিনি পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে একটি সরকারবিরোধী পোস্ট দেওয়া হয়েছিল এবং এটি নিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় কারো পক্ষে ফেসবুক ব্যবহার করা সম্ভব কিনা, পরবর্তীতে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে– এমন বিবেচনায় পরিকল্পনাটি বাদ দেওয়া হয় এবং ফেসবুক পোস্টটিও মুছে ফেলা হয়। কাইয়ুম দাবি করেন, তিনি পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় উক্ত সংসদ সদস্যের পুত্র থানায় আসেন এবং দূর্নীতি-অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা নিয়ে তার লেখালেখি ও অন্যান্য কর্মকান্ড বন্ধের বিনিময়ে তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু কাইয়ুম সেই প্রস্তাবে সম্মত হননি।

কাইয়ুমকে ১১ মে ২০১৯ বিকেলে আটক করে রাতে ত্রিশাল থানায় নিয়ে আসা হলেও তার বিরুদ্ধে ওই দিন কোন মামলা হয়নি। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১২ মে ২০১৯। অর্থাৎ মামলা দায়েরের আগেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তের বক্তব্য এবং ঘটনাক্রম অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, তার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোন অভিযোগ খুঁজে না পেলেও সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানির প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই মামলা করেন ইদ্রিস খান। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩, ২৫ ও ২৯ ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মামলার বাদী ও বিবাদী দুইজনই ময়মনসিংহ সদরের বাসিন্দা ছিলেন এবং অভিযুক্তকে ময়মনসিংহ সদর থেকেই আটক করা হয়েছিল; কিন্তু এরপরও তাকে ত্রিশাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। কাইয়ুম দাবি করেন যে, এর কারণ হলো- রুহুল আমিন মাদানি যে এলাকার সংসদ সদস্য, ত্রিশাল থানা সেই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে কাইয়ুমকে গ্রেফতার করানো এবং মামলা দেওয়া সহজ হয়েছে।

কাইয়ুম দাবি করেন, আটক করার সময় থেকে শুরু করে থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তিনি কয়েক দফায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমনকি তাকে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়া হয়েছে। নির্যাতনের মধ্যে চড়-থাপ্পড়, ঘুষি, বেল্ট ও চেয়ার দিয়ে আঘাত করার মতো বিষয়গুলো রয়েছে। একই সঙ্গে গালি-গালাজ, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনও ছিল। তিনি যে একজন মানবাধিকারকর্মী, এই বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও করেন।

২০১৯ সালের ১৩ মে সকালে কাইয়ুমকে ময়মনসিংহের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ড চাইলেও আদালত তাকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একাধিকবার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর ২ জুলাই ২০১৯ ময়মনসিংহ জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে কাইয়ুম জামিন পান। প্রায় দেড় মাস বন্দি-জীবন কাটিয়ে পরের দিন ৩ জুলাই ২০১৯ তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন।

কাইয়ুম যেহেতু একজন মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপার, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের এই মামলার ফলে তিনি পেশাগত দিক দিয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মামলা দায়েরের পাশাপাশি বাদীরপক্ষ থেকে কাইয়ুমের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণাও চালানো হয়।'সরকার বিরোধী',

‘হ্যাকার’ ইত্যাদি হিসেবে অভিহিত করে তাকে সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা চালানো হয়। মামলা এবং এ ধরণের প্রচারণার ফলে ওয়েবসাইট ডেভেলপার হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তিনি এখন আর আগের মত কাজ পাননা। কাইয়ুম বলেন, এই মামলার ফলে একদিকে যেমন তার অর্থ ও সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনি এটি তার ও তার পরিবারের সম্মানহানি ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি যেসব সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদেরকে কাইয়ুমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও বাদীর পক্ষ থেকে নানাভাবে চাপ দেওয়া হয়।

কাইয়ুম দাবি করেন, তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশ তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন, পেনড্রাইভ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংকের এটিএমকার্ড ইত্যাদি নিয়ে নেয়। এছাড়া পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার ইমেইল, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার একাউন্টের পাসওয়ার্ড জানাতেও তাকে বাধ্য করা হয়। ১ আগস্ট ২০২০ এ মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হলেও তিনি এখনো কোনো জিনিসপত্র ফেরৎ পান নি এবং ইমেইল, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পূর্বেকার কোন একাউন্টও তিনি ব্যবহার করতে পারছেন না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই মামলায় গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন পর কাইয়ুম কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধে বাদীর ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আরেকটি মামলা করেন। সেই মামলার অন্যতম সাক্ষী আবার আগের মামলার বাদী ইদ্রিস খান।

অভিযুক্ত কাইয়ুম দাবি করেন, তাকে হয়রানি এবং হেনস্তা করতেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এভাবে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাইয়ুম জানান, একজন মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশ বা প্রশাসনের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু এই আইনে মামলা হওয়ার পর থেকে তিনি একরকম ভীতি এবং নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। তিনি এখন আর আগের মত কাজ করতে পারছেন না এবং তাকে অনেক সতর্কতা মেনে চলতে হচ্ছে। কাইয়ুম বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং প্রভাবশালীরা সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। তিনি শুধুমাত্র তার নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা নয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটিও বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

সাংবাদিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে সম্পাদক পরিষদের মানববন্ধন

# টার্গেট: মাইদুল ইসলাম

*২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কোটা সংস্কার আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে ছাত্রলীগের রোষানলে পড়েন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাইদুল ইসলাম। পরবর্তীতে দুটি ব্যাঙ্গাত্মক ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ২৩ জুলাই ২০১৮ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারায় (সংশোধিত ২০১৩ এবং বিলুপ্ত ২০১৮) তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ৬ আগস্ট ২০১৮ তিনি হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জামিনের আবেদন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠায়। ৮ অক্টোবর ২০১৮ চট্টগ্রামের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। ৯ অক্টোবর ২০১৮ হাইকোর্ট ছয় মাসের জামিন দেওয়ায় নিম্ন আদালতের রিমান্ড আদেশ বাতিল করা হয়। ৩০ অক্টোবর ২০১৮ কারাগার থেকে মুক্তি পান মাইদুল। মাইদুল এখনো নানামুখী চাপের মধ্যে রয়েছেন এবং তিনি স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে বা আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।*

মাইদুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই বসবাস করেন। স্বায়ত্তশাসিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রত্যাশিতভাবে তিনি শুধু একাডেমিক কর্মকান্ডেই নয়, ব্যক্তিজীবনেও মুক্তবুদ্ধি বা মুক্তচিন্তার চর্চা করেন। একজন প্রগতিশীল শিক্ষক হিসেবে পরিচিত মাইদুল সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতির নানা অসঙ্গতি নিয়ে সোচ্চার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এগুলো নিয়ে তৎপর।

মাইদুলের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫৭(২) ধারায় ২৩ জুলাই ২০১৮ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানায় মামলা করেন মোঃ ইফতেখার উদ্দিন আয়াজ। মামলার এজাহারে বাদী নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন শিক্ষার্থী এবং ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এজাহারে তিনি দুইজন সাক্ষীর কথাও উল্লেখ করেন, যারা একই সংগঠনের ওই বিশ্ববিদ্যালয় শাখারই নেতা।

একজন প্রগতিশীল ও মুক্তমনা শিক্ষক হিসেবে মাইদুল যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে কথা বলেছেন, ছাত্রদের যেকোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন, তেমনি ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নানা অপকর্মেরও বিরোধিতা করেছেন। এ কারণে সংগঠনগতভাবে ছাত্রলীগ মাইদুলের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। মামলা দেওয়ার আগেও বিভিন্ন সময় হুমকি-ধামকি বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা এই ক্ষুব্ধতার প্রকাশ

ঘটিয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি বড় আন্দোলন হয়; যা কোটা সংস্কার আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। মাইদুল এই আন্দোলন ও ছাত্রদের পক্ষে কথা বলেন, এসবের সমর্থনে ফেসবুকে লেখালেখিও করেন। পরবর্তীতে মাইদুল তার ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে দেশ ও শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। এটা ছাত্রলীগকে আরো বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তাকে 'শায়েস্তা' করার একটা সুযোগ তৈরি হয়। এ কারণেই ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বাদী ইফতেখার উদ্দিন আয়াজ বিবাদী হিসেবে মাইদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

এজাহারে দুটি ফেসবুক পোস্টের কথা উল্লেখ করে বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি, তার ভাবমূর্তির প্রতি আঘাত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি অভিযোগ এনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারায় হাটহাজারী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, 'বাদীর টাইপকৃত এজাহার মূল এজাহার হিসেবে গণ্য' করা হয়েছে।

মাইদুল অভিযোগ করেন, মামলা দায়েরের দিনই ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী ফোনে তাকে গালিগালাজ এবং মৃত্যুর হুমকি দেন। প্রকাশ্যে তাদের কাছে ক্ষমা চাইলে এই মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে তাঁরা প্রস্তাব দেন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে। এরকম অবস্থায় মাইদুল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করতে বাধ্য হন। এরই মধ্যে ৬ আগস্ট ২০১৮ তিনি হাইকোর্ট থেকে অর্ন্তবর্তীকালীন জামিন পান। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ চট্রগ্রামের অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে আদালত তা বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠান। পুলিশ তাঁকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ মাইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে; ৮ অক্টোবর ২০১৮ চট্রগ্রামের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। কিন্তু পরের দিন হাইকোর্ট মাইদুলকে ছয় মাসের জামিন দেয়। এর ফলে নিম্ন আদালতের দেওয়া রিমান্ড আদেশ বাতিল করা হয়। মাইদুল ৯ অক্টোবর ২০১৮ হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও কারাগার থেকে মুক্তি পান প্রায় তিন সপ্তাহ পর ৩০ অক্টোবর ২০১৮। জামিন আদেশের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আদালত থেকে কারাগারে পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ার কারণেই তার মুক্তির ক্ষেত্রে এমন বিলম্বের ঘটনা ঘটে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন ন্যায়সংগত আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের কারণে মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়।
- মামলা করেন সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এক সাবেক নেতা।
- মাইদুলের বিরুদ্ধে এ মামলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ৫৭ ধারায় যা পরে বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু মাইদুলের বিরুদ্ধে মামলাটি চলমান রয়েছে।
- নিম্ন আদালত মাইদুলকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠান।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তাকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সামায়িক বরখাস্ত করে, তার নিরাপত্তা দিতেও অপরাগতা প্রকাশ করে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাইদুল প্রতিনিয়ত কটূবাক্য, হুমকী ইত্যাদির মুখোমুখি হন, শারিরীক হামলার আশংকায় ভোগেন।
- স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে কিংবা আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মাইদুল এখন অনেক বেশী সতর্ক।

মাইদুলের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার পর ছাত্রলীগ তাকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছিল। মাইদুল ও তার স্ত্রী দাবি করেন, আদালত থেকে জামিন পেয়ে ক্যাম্পাসে ফেরৎ আসার দিনও ছাত্রলীগ তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আবাসিক ভবনে তারা বসবাস করেন, ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা সেখানে এসে জটলা এবং হট্টগোল করে। মাইদুল অভিযোগ করেন, এরকম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং হাটহাজারী থানায় ফোন দিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাইদুলের জামিন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠানোর পর অতি দ্রুততার সাথে ঠিক তার পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। দ্বিতীয় দফায় জামিন পেয়ে মাইদুল যোগদানের জন্য আবেদন করলে সেটি নিয়েও শুরু হয় গড়িমসি। বেশ কয়েকদিন ঘুরিয়ে তারপর তাকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। একদিকে মাইদুলকে নিরাপত্তা দিতে প্রক্টরের অনীহা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তীতে বিভাগে যোগদানের অনুমতি দিতে বিলম্ব– সব মিলিয়ে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ছাত্রলীগের মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল।

মাইদুল বলেন, এই মামলার ফলে তিনি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কারাগার থেকে বেরোনোর পরে ছাত্রলীগ যেমন তাকে একাধিকবার হুমকি-ধামকি দিয়েছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তাকে অযৌক্তিভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে তিনি নিরাপত্তা শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাইদুল জানান, তিনি উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছুটি না দেওয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা অসহযোগিতায় তিনি সেই সুযোগ হারিয়েছেন। এই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে পড়ানো এবং গবেষণাই তার প্রধান কাজ। কিন্তু এই মামলা এবং মামলা পরবর্তী নানা ঘটনায় তার সেই কাজগুলো বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। একইভাবে নিরাপত্তাহীনতায় চলাফেরা সীমিত হয়ে যাওয়ায় তার আন্দোলন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আগের তুলনায় অনেকটা কমে গেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাস করলেও মাইদুল সর্বদা নিরাপত্তার শঙ্কায় ভোগেন। জামিন পাওয়ার পর ক্যাম্পাসে ফিরে তিনি এখনো প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ হুমকি ও গালিগালজের শিকার হচ্ছেন, এমনকি তিনি শারীরিকভাবে হামলার শিকার হতে পারেন বলে আশঙ্কা করেন।

এই মামলার ঘটনায় মাইদুলের পাশাপাশি তার স্ত্রী রোজিনা বেগমকেও নানারকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। মামলা হওয়ার পর তিনি সব সময় মাইদুলের পাশে ছিলেন এবং থানা-পুলিশ, আদালতের বিষয়গুলো সামলেছেন। রোজিনা চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষকতা করতেন। মাইদুলের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনায় তিনি সেই চাকরিটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রোজিনা জানান, তিনিও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে মাইদুলকে একা রেখে দেশের বাইরে যাওয়াটা তার কাছে নিরাপদ মনে হচ্ছে না। রোজিনা অভিযোগ করেন, মামলার পর ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা নামে-বেনামে তাকে এবং মাইদুলকে জড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়েছে, নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করেছে এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। এতে একজন নারী হিসেবে তিনি বিশেষভাবে আক্রান্ত বোধ করেছেন এবং এ ঘটনাগুলো তার মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাইদুলের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের যে ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই ৫৭(২) ধারায় ছিল, কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ১৪ বছর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। ৫৭(১) ধারায় ছিল, কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরণের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ছিল একটি বহুল আলোচিত-সমালোচিত বিষয়। আইনজ্ঞরা বলেছিলেন, এই ধারাটি বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এটাকে অপব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। বহু হয়রানিমূলক মামলা হওয়ার কারণে সরকার এই ধারাটি বাতিল করে এবং পরবর্তীতে তথ্য প্রযুক্তি আইনের পরিবর্তে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর করে। কিন্তু আগের আইনে দায়ের হওয়া মামলাগুলো এখনো চলমান রয়েছে এবং মাইদুলের মতো ভুক্তভোগীরা এখনো সেই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

নানামুখী চাপ ও বাধা সত্ত্বেও মাইদুল মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রাখতে চান। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি নিয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ এবং সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অথবা এর পরিবর্তিত সংস্করণ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী হিসেবে অভিহিত করে তা বাতিলের দাবি জানান।

# উপসংহার ও সুপারিশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন উভয়ের ক্ষেত্রেই সরকার বারংবার অঙ্গীকার করেছে যে, এই আইনগুলোর অপব্যবহার রোধ করা হবে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, সরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য মানবাধিকার কর্মীদের এই আইনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করছে।

### বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমাদের দাবীঃ

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পূর্ণ ও স্বাধীন পর্যালোচনা করা এবং এই আইনকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সনদের (বাংলাদেশ যার পক্ষভূক্ত) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মত ন্যায্য অধিকার চর্চার কারনে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে অনতিবিলম্বে এবং শর্তহীনভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়ে মুক্তি প্রদান;
- যে কোন ব্যক্তি যেন অনলাইনে অথবা অফলাইনে ভয়ভীতি ছাড়া সমালোচনা অথবা উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা;
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় এবং মানবাধিকারকর্মীদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রশাসনিক বাধাসমূহ দূর করা;
- যেকোন আইন প্রণয়নের পূর্বে কার্যকরী ও ফলপ্রদ নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে করে মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবাদ-মাধ্যম ও অন্যান্য অংশীজনরা তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারে;
- মানহানিকে ফৌজদারী অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে একে দেওয়ানী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা;
- জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের উন্মুক্ত আমন্ত্রণ জানানো এবং জাতিসংঘের চুক্তি কমিটিতে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো;
- মানবাধিকারকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদানমূলক এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা গ্রহণ যা মানবাধিকারকর্মী সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণাকে বাংলাদেশে কার্যকর করতে পারে।

# সংযোজন

এই প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েকদিন পূর্বে, ১৬ জানুয়ারি ২০২২ কূটনীতিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে, সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের প্রতি নজর দিতে প্রস্তুত।

এই ঘোষণা ইতিবাচক। তবে যেহেতু প্রায় ৪৫০০ মামলা চলমান, তাই সরকারকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওই মামলাগুলোয় আইনের অপব্যবহার হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী ও মানবাধিকারকর্মীদের উচিত হবে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা। এই প্রতিবেদন প্রকাশের প্রায় দু'মাস পূর্বে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স প্রাথমিক অনুসিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করে আইন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চাইলেও প্রতিবেদন প্রকাশ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন জবাব পায়নি।

# কৃতজ্ঞতা

প্রচ্ছদের কার্টুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক ও জেল খাটা কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরের আঁকা।